দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

উন্নয়নের পূর্বশর্ত শিক্ষা

[ফজলে হোসেন আবেদ। ব্র্যাক-এর নির্বাহী পরিচালক। তাকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের সমস্যা নিরসনে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সাফল্যজনক বাস্তবায়নের ফলে ১৯৮০ সালে 'কমিউনিটি লীডারশীপের' জন্য ম্যাগসাইসাই পুরস্কার প্রদান করা হয়।]

আমাদের এই দরিদ্র দেশে অনেক সমস্যা বিরাজ করছে যার মধ্যে রয়েছে খাদ্রসমস্যা, শিল্পায়ন সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা ইত্যাদি। এর মধ্যে কোনটকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত সেই বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ। তবে এটা সর্বজনবিদিত যেকোন জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষার হার শতকরা মাত্র ৩২ ভাগ। যার মধ্যে নারীশিক্ষার হার ২২ ভাগ। এই হারের মাপকাঠিও শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করার মধ্যে সীমিত। ৩২ ভাগ শিক্ষিতের হারে প্রতীয়মান হয় দেশের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ অশিক্ষিত। শিশুশিক্ষার ছবিও ভয়াবহ। সম্প্রতি ইউনিসেফের এক জরিপে দেখা যায় যে, গত বছর বাংলাদেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের স্কুলে যাবার যোগ্য ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৭ লাখ। এর মধ্যে ৬৯ লাখ ছেলেমেয়ে কোন সময়েই কোন স্কুলে ভর্তি হয়নি। উপরন্তু যারা ভর্তি হয়েছিল কিন্তু পরে ঝরে পড়েছে তাদের সংখ্যা ৫৯ লাখ। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ১ কোটি ২৮ লাখ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

আমাদের উন্নয়ন বাজেটের সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়ে থাকে শিক্ষাখাতে। মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা আছে এবং সম্প্রতি সার্বিকভাবে স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গম বরাদ্দেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এতে স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বা উপস্থিতি কিছুটা বাড়লেও শিক্ষার প্রসার এবং মান আশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠেনি। স্কুলে ভর্তির নিয়মিত উপস্থিতির হারও আশানুরূপ হচ্ছে না এবং এখনও ঝরে পড়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অত্যধিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রাথমিক তথা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি যাতে আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং তৃণমূল থেকে প্রতিটি পর্যায়ে নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিষয়গুলোর অভাবেই শিক্ষার মান উন্নয়ন ও প্রসারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্র্যাকের কার্যক্রমের মধ্যে প্রথমে ছিল না। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পিতামাতাদের অনুরোধে ১৯৮৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ২২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এই পরীক্ষার চমকপ্রদ সাফল্যের ফলশ্রুতিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অতিদ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের প্রাথমিব শিক্ষা ব্যবস্থায় কয়েকটি বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। যেমন আমাদের স্কুলে ৩৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং একজন শিক্ষিকা বা শিক্ষক থাকেন। এর মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে ছাত্রী এবং ৯৫ ভাগ শিক্ষক হচ্ছেন মহিলা। একই শিক্ষিকা শিশুদের ৩ বছর পড়িয়ে আনুষ্ঠানিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর জন্য তৈরি করে দেন। অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কুলের সময় নির্ধারণ করা হয় কারণ পল্লী অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা গৃহস্থালি ও মাঠের কাজে পিতামাতাকে সাহায্য করে থাকে। বাড়িতে করার জন্য কোন লেখাপড়ার কাজ স্কুল থেকে দেয়া হয় না, কারণ সাহায্য করার জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষক রাখার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তাদের পিতামাতারাও নিরক্ষর। নিয়মিত সঙ্গীত, অংকন, নাটিকা, খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে লেখাপড়াকে উপভোগ্য করা হয়। এছাড়া তাদের বিনামূল্যে শিক্ষাদান ছাড়াও বইপত্র খাতা পেন্সিল শ্লেটসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়। আমাদের ঝরে পড়া শিশুদের হার মাত্র ২ থেকে ৫ ভাগ এবং তাদের ৯৫ ভাগই তিন বছর পর আনুষ্ঠানিক স্কুলে প্রবেশ করে। বর্তমানে আমাদের স্কুলের সংখ্যা পঁচিশ হাজার তিনশত বিশ-এ দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিমাসে গড়ে ৫০০টি করে স্কুল বেড়ে চলেছে। আমরা আশা করি আগামী বছরের শেষ নাগাদ ব্র্যাক স্কুলের সংখ্যা ৩৪ হাজারে দাঁড়াবে। বর্তমানে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্র্যাকের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই পদ্ধতি সারা বিশ্বে, বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং ঝরে পড়া হতভাগ্য এই দরিদ্র ছেলেমেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়াই আমাদের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য। আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে আরও অনেক সংস্থার এগিয়ে আসা উচিত।